রবিবাসরীয় আজকাল

ক্যান্সার চিকিৎসার আকার প্রকার

অরুণাভ সেনগুপ্ত

অচেনা সেতুবন্ধ

অফিসেই মার ফোনটা এল, বাবার বাইওপ্সির ফল ক্যান্সারই। এত দুরে অন্য শহরে বসে কি করবে অদিতি গুগলে ডুব দেওয়া ছাড়া! পরের ক দিন ব্যাপারটা ক্রমশ গুলাতে থাকে। কি চিকিৎসা, কোথায় চিকিৎসা,কত খরচ? নেট-দুনিয়ার সংখ্যাতত্ত্বের শতকরা হিসাবে ঠিক তার বাবার কি হবে তার জবাব মেলে না। আত্মীয়দের নানা মত। বড় পিসী রেগে অস্থির, "জানিস না বাইওপ্সিতে ক্যান্সার ছড়িয়ে যায়! তোর মার যেমন বুদ্ধি!" । স্ত্রীর ক্যান্সার ধরা পড়ায় হতবুদ্ধি হারান মণ্ডলও, শহরের বড় হাঁসপাতালে চিকিৎসা জরুরী। মুস্কিল আসান হয়ে আসে চেন্নাই থেকে 'গ্রান্টী' দিয়ে রুগী ভাল করে আনা মকবুল। জমি বিক্রি, চাঁদা তোলা, টাকা পয়সা সামলান সবই করে সে। মস্ত চাকুরে মিঃ রায় আবার খালি ডাক্তারদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে রাজি নন । বাড়তি বিমা হিসাবে যোগ করেন ভিয়েতনামি সন্ন্যাসীদের গুপ্ত জ্ঞানের নিদান। সিয়াটল থেকে ব্লগ লেখে রবিনা, তার মার মত ক্যান্সার রুগীদের মতামত চেয়ে। মার ডাক্তারের ব্যবস্থাপ্র তার মনঃপূত নয়।

ছবিগুলো কাল্পনিক নয়। প্রতিনিয়ত ঘটা বাস্তব। এমনি রোগ ক্যান্সার, ধনী- দরিদ্র-দেশ-সমাজ নির্বিশেষে প্রথম ধাক্কায় সবাইকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক অজানা সেতুবন্ধের সামনে। । অনিশ্চয়তা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে যার ওপারে দৃষ্টি চলে না সাধারণ মানুষের, এমন কি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও সর্বত্র আলো ফেলতে অপারগ। তবে ছবিটা ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছে । এই মারণ রোগ জয়ী মানুষের সংখ্যা এখন আমাদের চারপাশেই প্রচুর।

কয়েকটি আপ্তবাক্য

আগের বাক্যটা আসলে বলতে হবে অন্য ভাবে। সেটা হল, 'সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে' চিকিৎসা করিয়ে এই মারণ রোগ জয়ী মানুষের সংখ্যা এখন আমাদের চারপাশেই প্রচুর। ঐ দু টাই মোদ্দা কথা । 'সময়' আর 'পদ্ধতি'। ক্যান্সার চিকিৎসার আপ্ত বাক্য। জানা দরকার আরও কয়েকটি আপ্ত বাক্য। যেমন , " ক্যান্সার একটিমাত্র রোগ নয়। শরীরের এক এক অঙ্গে এর এক এক রূপ, এক এক রকম উপস্থাপনা , চলন, বৃদ্ধি। কেউ সহজেই নিরাময় যোগ্য, কেউ বা বহু চিকিৎসাতেও দুরারোগ্য"। রুগীর শরীরের নিজস্বতাও অনেক ক্ষেত্রে এর চলন পালটায়। বলাইয়ের মার স্তনের ক্যান্সার কানাইয়ের মার স্তনের ক্যান্সার থেকে চরিত্রে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনেকটাই আলাদা হতে পারে। দ্বিতীয় আপ্তবাক্য, রোগের ধরণ বুঝতে খুব জরুরী চটজলদি বাইওপ্সি। বাইওপ্সি রোগ ছড়ায় এমত ভ্রান্ত ধারনা অনেক সর্বনাশের কারণ । আর তৃতীয় আপ্ত বাক্য, ক্যান্সার চিকিৎসা সাধারণত এক কালীন বা এক মাত্রিক নয়, দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায় ক্রমে এর বিবিধ চিকিসা চলতে পারে। আরোগ্যলাভের পরও প্রয়োজন থাকে নিয়মিত যাচাইয়ের। নিঃসন্দেহে অস্মদেশীয় অবান্ধব স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসার একটা অন্তরায় তবে এ লেখাটার দৃষ্টিকোণ ডাক্তারির, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়পড়তা ক্যানসার বা 'সলিড টিউমারদের' চিকিৎসার নীতি পদ্ধতি।

কেটে, পুড়িয়ে, বা বিষ প্রয়োগে

চতুর্দশ শতাব্দীতক গ্রীক-রোমান, ইসলামিক, আয়ুর্বেদ সব শাস্ত্রেই মানবশব ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় জানা ছিল না শরীরের ভিতরের বিন্যাস ও বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়াশীল সম্পর্ক ফলে ক্যানসারের গতি প্রকৃতি বুঝতে না পারা প্রাচীন চিকিৎসকরা একে এক রহস্যময় মারণ রোগ হিসাবে এড়িয়ে চলতেন। রেনেসাঁ উত্তর তিন চারশ বছরে ইউরোপীয় শারীরবিদদের গবেষণা আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার জন্ম দিল রোগ-বিদ্যার, কোষ কলা পরীক্ষা করে রোগের প্রসার-পথ চিনতে পারার জ্ঞান। অনেক ক্যান্সার রুগীর পর্যবেক্ষণ-ব্যবচ্ছেদ করে

শল্য চিকিৎসক আর শারীরবিদরা এক তত্ব ঠাওরালেন – ‘ শরীরের এক জায়গায় শুরু হওয়া ক্যান্সার কোষগুলি কেন্দ্রাতিগ বলের মত বৃত্তাকারে পর্যায় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে , প্রথমে নিকটস্থ লসিকা গ্রন্থিতে, ক্রমশ দূরে, আর শেষে রক্ত বাহিত হয়ে উৎপত্তিস্থল থেকে দূরে হয় তাদের স্থানান্তরণ বা ‘মেটাস্টাসিস’ । এই তত্বকে ভিত্তি করে শল্যবিদরা সিদ্ধান্ত করলেন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের সাথে চারপাশের কোষকলা সমূহ ও আঞ্চলিক লসিকা গ্রন্থিগুলোকে সমূলে বাদ দিলে ক্যান্সারের নিরাময় সম্ভব। অজ্ঞান করার পদ্ধতির আবিষ্কার আর জীবানুক্রিয়া নিরোধক ধ্যান ধারনার প্রচলন শল্যচিকিৎসাকে কিছুটা নিরাপদ করায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শল্যবিদরা আরম্ভ করলেন “রাডিক্যাল অপারেশন” - ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গের সাথে তার চারপাশের কোষকলা ও লসিকা গ্রন্থিদেরও বাদ দেওয়া। তাঁদের তত্ব টা যে জোরদার ছিল তার প্রমাণ একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই পদ্ধতি অগুনতি রুগীকে ভাল করেছে , এখনো করছে। কিন্তু চিকিৎসকরা লক্ষ্য করলেন অস্ত্রোপচার সফল হলেও তো সর্বদা রোগমুক্তি হচ্ছে না! চিকিৎসিত রুগীদের তথ্য বিচার করে চিকিৎসকরা বুঝলেন রোগমুক্তি নির্ভর করে কি অবস্থায় অস্ত্রোপচার হচ্ছে তার ওপর। অতএব দরকার হোল ক্যান্সারকে তার পরিমাপ ও বিস্তারের পরিসর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্টেজে ভাগ করার, প্রথম, দ্বিতীয় , তৃতীয় , ও চতুর্থ। শল্যবিদদের চেষ্টা থাকত প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ অসুখটা ছড়িয়ে পড়ার আগেই ব্যাপক অস্ত্রোপচারে রোগের মূলোৎপাটন করা। বর্তমান ক্যান্সার শল্য চিকিৎসার উদ্দেশ্য সেই মূল নীতিকে ব্যাহত না করেও যথা সম্ভব কম অঙ্গহানি করে শারীরিক সৌন্দর্য ও স্বাবাভাবিক ক্রিয়াকে অক্ষুণ্ণ রাখা। নানা নতুন পদ্ধতি আর যন্ত্রের আবিস্কার ও অন্যান্য সহায়ক চিকিৎসার উন্নতিতে সে উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই সফলকাম।

১৮৯৫ তে রন্টজেন আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মি এক্স-রে আর তার ক বছর বাদেই হেনরি বেকারেল ও কুরি দম্পতির আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জীবকোষের উপর অনিষ্টকর প্রভাব দেখে শুরু হোল এদের সাহায্যে ক্যান্সারের কোষগুলোকে নষ্ট করে দেবার চিন্তা ভাবনা। বিপত্তি দেখা গেল মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়, শুধু ক্যান্সার কোষই না, অদৃশ্য শক্তির বিচ্ছুরণের ফলে নষ্ট হতে থাকল সংলগ্ন অন্যান্য কোষকলাও। দৈনন্দিন চিকিৎসায়

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বা এক্স –রের নিহিত শক্তির সঠিক ও নিরাপদ প্রয়োগের জন্য তাই অনুসন্ধান চলল এমন সব উৎস ও যান্ত্রিকব্যবস্থার যাতে বিস্ফুরণের তীব্রতা, মাত্রা, বিস্তৃতি এবং অভিক্ষেপণ সবই কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সংলগ্ন সুস্থ অংশের ন্যুন্যতম ক্ষতি করে শুধুমাত্র ক্যান্সার কোষগুলোকেই আঘাত করা যাবে । সে প্রয়োজন বহুদিন কোবাল্ট ৬০ যন্ত্র কিছু মাত্রায় মেটালেও এখন আরও উন্নত লাইনাক যন্ত্র ব্যবহার করে প্রথাগত রশ্মি চিকিৎসার সাথে যোগ করা যায় নানান কায়দা , যেমন টিউমারের আকৃতি অনুযায়ী বিস্ফুরণ (কনফরমাল রেডিয়েশন থেরাপি) ; বিভিন্ন তীব্রতার নিয়ন্ত্রনী বিস্ফুরণ (ইন্টেন্সিটি মডুলেটিং রেডিয়েশন থেরাপি) বা যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবি নিয়ন্ত্রিত বিস্ফুরণ (ইমেজ গাইডেড রেডিয়েশন থেরাপি)। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাতে সব পদ্ধতিতেই নিয়ম বিকিরণের সমগ্র পরিমাণকে দৈনিক স্বল্প মাত্রায় দু-চার সপ্তাহ ধরে ভাগ করে দেওয়া । সাধারণ ভাবে বিকিরণের উৎসটি শরীরের বাইরে থাকলেও (টেলিথেরাপি) দু একটি ক্ষেত্রে, যেমন জরায়ুর ক্যান্সার , তা শরীরের ভিতরে রাখা হয় (ব্রাকিথেরাপি) । সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সাধারণ রশ্মির ফোটন বা আলোক কণার বদলে পরমাণুর অন্তঃস্থিত প্রোটন কণার ব্যবহার। আরও নিরাপদ এবং ফলপ্রসূ তবে অত্যধিক ব্যয় সাপেক্ষ, ভারতবর্ষে সবে দু একটি হাসপাতালে চালু হচ্ছে।

শল্যচিকিৎসা বা রশ্মিচিকিৎসা শুধুমাত্র স্থানীয় ভাবে কার্যকরী। ভ্রাম্যমাণ রক্তবাহিত ক্যান্সার কোশগুলকে মারার উপায় ভেষজ বা রাসায়নিক চিকিৎসা । বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত নাইট্রোজেন মাস্টারড গ্যাসের শরীরের রক্তকনিকাগুলকে নষ্ট করে দেবার ক্ষমতা লক্ষ্য করে ১৯৪৫ নাগাদ শুরু হল লিম্ফোমা , লিউকেমিয়া ইত্যাদির রাসায়নিক চিকিৎসা যার সুফলে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করলেন আরও নানা শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ যাদের কাজ হল ক্যান্সার কোশগুলির দ্রুত বিভাজন ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার চলমান চক্রকে নানা পর্যায়ে বানচাল করা। কিন্তু রাসায়নিক বিষ ছড়িয়ে পড়ে শরীরের সর্বত্র , আক্রান্ত হয় বিভজ্যমান অন্যান্য কোষকলাও, বিশেষত রক্তমজ্জা ও অন্ত্রের দ্রুত বিভাজমান কোষ, যার ফল মারাত্মক জীবন হানিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তা এড়াতে প্রয়োজন ওষুধের সঠিক মাত্রা ও প্রয়োগবিধি আর শরীরকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে দেবার

জন্য দুই প্রয়োগের মাঝে কিছুটা বিরতির। বহু গবেষণার পর প্রতিটি অসুখের জন্য নির্বাচিত হয়েছে সর্বোত্তম মাত্রা ও প্রয়োগবিধি নিয়ে ওষুধের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র। আন্তর্জাতিক শীর্ষ সংস্থাগুলির অনুমোদিত সে নির্দেশবিধি পৃথিবীর সর্বত্রই চিকিৎসকরা পালন করেন, অন্যথা শুধু রুগীর শারীরিক ও আর্থিক অবস্থার বিচারে কিছু পরিবর্তন পরিমার্জনে। ভেষজচিকিৎসার অগ্রগমন বহুলাংশে জয় করেছে শিশুদের ক্যান্সার ও কিছু 'লিকুইড টিউমার' বা রক্তের উপাদান জনিত ক্যান্সার, তবে সে চিকিৎসা অতি জটিল ও প্রলম্বিত। বাড়াবাড়ি অসুখে বেশী মাত্রায় ওষুধ দেবার একটা পদ্ধতি হল ভেষজ চিকিৎসার আগে রুগীর মজ্জা নিষ্কাশন করে তা হিমায়িত করে রাখা আর ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় রুগীর মজ্জায় রক্ত তৈরির উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে গেলে ঐ জীয়ান মজ্জার আবার প্রতিস্থাপন। পদ্ধতিটি জটিল, ঝুঁকিপূর্ণ, এবং ব্যয়সাধ্য । রক্তমজ্জার ক্যান্সারের অন্তিম পর্যায়ে এ চিকিৎসা জীবনদায়ী হলেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্যান্সারে মজ্জা প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতা এখনও তত উৎসাহজনক নয়।

আরেক উপায় জৈবিক চিকিৎসা বা লক্ষ্যভেদী ওষুধের ব্যবহার – রুগীর ক্যান্সার কোষগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের বংশবৃদ্ধির সহায়ক প্রক্রিয়া বা সংকেত ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্তর্ঘাত। স্তন, ফুসফুস ইত্যাদি কয়েকটি ক্যানসারে ও সাধারণ রাসায়নিক চিকিৎসায় অজেয় কিছু ক্যান্সারে এটি একটি চালু চিকিৎসা। সুবিধা হল এদের অনেকগুলি ওষুধই ট্যাবলেট আকারে , সহজসেব্য, মুস্কিল নাগাল ছাড়ান দাম আর অনেকদিন খেতে হয় । সম্ভাবনা জাগান নতুন রাস্তা হল শরীরের প্রতিরোধশক্তির শক্তিবর্ধন । ক্যান্সারের উৎপত্তির মূল হল মানব-দেহকোষের বিভাজনের নির্দেশবাহী জিনগুলির কোনটির মিউটেশন বা বিকার আর তাদের শরীরের অতি বিস্তৃত নিরাপত্তা জালকে লুকিয়ে নানা পথে কিছু কোষকে অনিয়িন্ত্রিত বিভাজনের সংকেত পাঠানর ক্ষমতা অর্জন। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিপথগামী কোষগুলিকে অকেজ করে দেওয়ার এ রকম একটি চিকিৎসায় ভয়াবহ মেলানকারসিনমার চতুর্থ পর্যায়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ।

বহুমাত্রিক চিকিৎসা

চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সাধারণত ক্যান্সারের চিকিৎসা একাধিক ধারার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে সর্বাগ্রে রোগের পর্যায় বা স্টেজ ঠিক করতে ব্যবহার হয় TNM পরিমাপ ব্যবস্থা (T –টিউমারের মাপ, N –রোগগ্রস্ত নোডের বর্ণনা, M– মেটাস্টাসিস আছে কি না)। মানদণ্ড প্রতিটি অঙ্গের জন্য আলাদা। Breast – T3aN2bM0 লিখলে বিশ্বের যে কোন চিকিৎসক বুঝে যাবেন, মূল টিউমার কত বড়, কটা নোড আক্রান্ত, মূল টিউমার থেকে স্থানান্তরণ হয়েছে কিনা, রোগটা কোন পর্যায়ের বা কতটা সংকটজনক। প্রাথমিক ভাবে রুগীকে পরীক্ষা করে ও খুঁটিয়ে ছবি তুলে এই পরিমাপ নির্ধারিত হলেও আসল হিসাব হয় শল্য চিকিৎসায় বাদ দেওয়া অংশের বাইওপ্সির পরে । এখন যোগ হয়েছে ক্যান্সার কোশগুলির চরিত্র জানতে জৈবানুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মায় জিন ঘটিত গণ্ডগোলের পরীক্ষা। ক্যান্সারটির বিস্তৃতি ও উগ্রতা ক্ষতিয়ে দেখে ঠিক হয় অস্ত্রোপচারের পর অন্য সহায়ক চিকিৎসার, রশ্মি, রাসায়নিক, বা জৈবিক, প্রয়োজন ও পরিমাণ। কিছুক্ষেত্রে রশ্মি বা রাসায়নিকের পূর্বচিকিৎসায় অসুখটাকে আয়ত্তে এনে পরে অস্ত্রোপচার হয়। কখনো রুগীর অগ্রহণীয় অঙ্গহানি এড়াতে, যেমন স্বরযন্ত্র ইত্যাদির ক্যান্সারে, সীমিত অস্ত্রোপচার করে বা আদৌ না করে শুধু রশ্মি বা ভেষজ চিকিৎসা করা হয়।

বিকল্প চিকিৎসা

‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু’ ভাবধারার কিছু লোকেদের ধারণা বিজ্ঞান লব্ধ চিকিৎসাপন্থার নাগাল সীমায়িত। অপার্থিব অতীন্দ্রিয় পথে লব্ধ পন্থার যোগ জীবনদায়ী অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে। সর্বকালে সর্বদেশে মানুষ খোঁজ করেন চমৎকারী উপায়ের । তাই হঠাৎ ক্যান্সার রুগীদের ভিড় হয় কাছেই নাকালি গ্রামের মজা ঝিলের পাঁক মাখতে। তাই হলিউডের হট্টাকট্টা অভিনেতা স্টীভ ম্যাকুইন নিষিদ্ধ ‘ওষুধ’ লীট্রাইলের খোঁজে গোপনে ঠাঁই গাড়েন মেক্সিকোর এক স্পা’তে। বা স্কুল পালান হ্যারী হক্সি হন ডালাসে দুনিয়ার বৃহত্তম বেসরকারি ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র সহ ১৭টি ক্লিনিকের মালিক। সৌজন্যে তাদের ক্যান্সার

চিকিৎসার পারিবারিক গুপ্তবিদ্যার সূত্রপাত এক পূর্বপুরুষের দৃষ্ট তাঁর ঘোটকটির এক ধরনের লতাপাতা ঘষটে নিজের গোড়ালির ক্যান্সার সারাবার ঘটনা এ রকম একটি গল্প-গাথা ।

অধুনা ক্যান্সারের সংখ্যা বৃদ্ধির পর এদেশেও অব্যর্থ ক্যান্সার চিকিৎসার হরেক প্রতিষ্ঠান । কারো পুঁজি সন্ন্যাসী-দত্ত গুপ্তজ্ঞান কারো বা আদি-শাস্ত্র বা দ্রব্যগুণের অনুপ্রাণিত গবেষণা। এই শহরই এরকম তিনটি গণমাধ্যম তোলপাড় করা আবিষ্কারের সাক্ষী। তর্ক উঠতে পারে, ব্যক্তিগত এষণায় বিকল্প পথে রোগ নিরাময়ের উপায় আবিষ্কারে আপত্তি কোথায় ? আপত্তি নেই তো বরং আগ্রহ আছে। বিজ্ঞানের আধুনিক কেন্দ্রগুলিতে বিকল্প চিকিৎসা নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়। বাজারে অনেক দাবীদার থাকলেও আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থাগুলি কিন্তু ক্যান্সার জয়ের গৌরব দাবী করে না। নানা বাস্তব পরিস্থিতিও অবশ্য অনেকের বিকল্প ব্যবস্থা সন্ধানের কারণ। সে সারিতে একপ্রান্তে বিত্তহীনের প্রথাগত চিকিৎসার মূল্য যোগাতে অপারগতা, অন্য প্রান্তে বিত্তবানের 'অধিকন্তু না দোষায়' ভাবনা। মধ্যখানে আছেন বিজ্ঞাপনে পথভ্রান্ত আম জনতা, তাদের এটা সেটা করে দেখার প্রবণতা।। তবে সাধু সাবধান, সময় নষ্ট না হয়।

ক্যান্সার চিকিৎসার শেষ, আসলে প্রথম, আপ্তবাক্য, 'আরোগ্যের থেকে প্রতিরোধ শ্রেয়'। শুধু সচেতনতা ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির পালনেই আমাদের দেশে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার চল্লিশ শতাংশ কমে যাবে।